سورة آل عمران مدنية وهي مائتا آية وعشرون ركوعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٣
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥
هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ؕ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ
الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

সূরা আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ঃ ২০০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। (৪) নাযিল করেছেন তওরাত ও ইঞ্জীল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বকালে সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আঃ) আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ঐসব তত্ত্বের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এরপর মূসা ও হারুন আলাইহিমাস্ সালাম এবং তাঁদের বংশের পয়গম্বরগণ আগমন করেন। তাঁরা সবাই সে একই কলেমায়ে তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আঃ) সেই একই আহবান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাঁদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য পয়গম্বরের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাঁদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাঁদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তাঁরা পূর্বসূরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়।

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী এত বিপুল

সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাঁদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাঁদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত।

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে,— কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান একবার হুযুর (সাঃ)— এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু'একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খ্রীষ্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, উপাসনা একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ উপাসনার যোগ্যও নয়।

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রধান চারটি 'সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্যের সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণান্বিত, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ, রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের (সাঃ) মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্ব সাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণ মানুষের জন্যে বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত ঘাঁটা-ঘাঁটি করার অনুমতি নেই।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটি বুঝে নেয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ কোরআন মজিদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্‌কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহ্‌কামাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে। (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তাআলা 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য; অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা, কদর্থ করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (সে আমার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ

অর্থাৎ, – আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।

এসব আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র'— খ্রীষ্টানদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 'আল্লাহ্‌র বাক্য' এবং 'আল্লাহ্‌র আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহপূর্বক যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ – এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ
اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَاْبِ
اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ
لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى
كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

(৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে; এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না। (১০) যারা কুফুরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ্র আযাব অতি কঠিন। (১২) কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগ্গীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে— সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান (১৩) নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। (১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?— যারা পরহেযগার, আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত— তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।

وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ –'জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী' কারা? এ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এঁরা হলেন আহ্লুস সুন্নাত-ওয়াল-জমাআত। তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্র সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে কেরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাঁদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহ্র নিকটই সোপর্দ করেন। তাঁরা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নন; বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর-দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাঁদের মন-মস্তিক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তাঁরা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক প্রকার, অর্থাৎ, সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্যে উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্যে আল্লাহ্ তাআলা তা গোপন রাখেন নি; বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ, অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ হেকমতের কারণে বর্ণনা করেননি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। – (মাযহারী)

প্রথম আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রসূল (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন অন্তর নেই যা আল্লাহ্ তাআলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়! তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা, তাই করেন। কাজেই, যারা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্যে দোয়া করে। হুযুর (সাঃ) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك অর্থাৎ, হে অন্তর আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ। – (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ –এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফেরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফের বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে

কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাযার। তাদের কাছে সাত শত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তুরটি উট, দুইটি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তাআলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)— এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোট কথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। – (ফাওয়ায়েদে- আল্লামা ওসমানী)

দুনিয়ার মহব্বত ঃ হাদীসে বলা হয়েছে حب الدنيا رأس كل خطيئة (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।) প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্যবস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,— মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্য। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন। এর পর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্খিত ও প্রিয়বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে— যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিগকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশে বাজারে পৌঁছে। চিন্তা করলে দেখা যায়; এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে নিজ নিজ গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়া জোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালন-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নেয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নেয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি। অর্থাৎ, এসব বস্তুর ভালবাসা স্বাভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে।

মোটকথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা কৃপাবশতঃ মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মত্ত হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ্ তাআলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও লাভবান হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে তার পথ প্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকাল এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তিভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অর্থাৎ, এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্যে; মন ভোলাবার জন্যে নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ, সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না।

১৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত, তারাই এ নেয়ামত পাবে। সে নেয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত— যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ, রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নেয়ামতরাজির মধ্যে বহ্যতঃ তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম— জান্নাতের সবুজ কানন; দ্বিতীয়— পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং তৃতীয়— আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমতঃ সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং সেখানে মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার যত সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমতঃ জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ্ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা হবে।

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন প্রাসাদের একটি ইঁট সোনার ও একটি ইঁট রূপার হবে। মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুই প্রয়োজন হবে না। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্যে উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে আরোহণ করে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে যাবতীয় শস্যই আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই হবে না। তবুও যদি কেউ কৃষি কাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপন, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হুরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জান্নাতীদের জন্যে কোরআনের ওয়াদাও রয়েছে যে, وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ, তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে। এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণভাবে মানুষ যার কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অশেষ সন্তুষ্টি। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্খাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জান্নাতিগণ বলবেন ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নেয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নেয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ এখন আমি তোমাদের সব নেয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নেয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টিলাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেয়ার অথবা হ্রাস করে দেয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযূর (সাঃ) বলেছেন ঃ "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত; তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়।"

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

(১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।" আর আহ্‌লে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। (২১) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَهِدَ اللّٰهُ .... **আয়াতের ফযীলত ঃ** এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে রকম লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন ঃ আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। তারা আরও বললেন ঃ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ প্রশ্ন করুন। তারা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোন্‌টি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন ঃ "হে পরওয়ারদেগার আমিও এরসাক্ষ্যদাতা।"

'দ্বীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় دين শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دين সেসব মূলনীতি ও বিবিধ–বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরীয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখার বিধি–বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে সে দ্বীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ্ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায়, সব পয়গম্বরের দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ–ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কেয়ামত দিবস, হিসাব–নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী–রসূল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি–বিধানের আনুগত্য

করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ্ (আঃ) বলেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। – (সূরা ইউনুস) এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

হযরত ঈসা (আঃ)–এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল ঃ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 'সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।'

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে–মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে— যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)–এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সাঃ)–এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রসূলের (সাঃ) আবির্ভাবের পর কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এধর্মই আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য–অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহত ঃ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে— সে ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু; প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

–অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তথা বরযখ–জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব–নিকাশ হবে কেয়ামতে। এ হিসাব–নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ
اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ
فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن
تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

(২৩) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে—আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহবান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ধোঁকা খেয়েছে। (২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করবো-যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে—তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না। (২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ্‌! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্‌ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে-নুযূল ঃ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরেক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সবাই মিলে ইসলাম ও মুলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব কোরবান করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একটি সম্মিলিত ঐক্য গড়ে উঠলো। ওরা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনা অবরোধ করে বসলো। কোরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে-আহ্‌যাব' অর্থাৎ, সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে-খন্দক' নামে উল্লেখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন যে, শত্রু সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী, আবুনায়ীম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর উপর অর্পন করা হয়। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে, যাতে শত্রু সৈন্যরা সহজে অতিক্রম করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজ বন্ধ রাখা দুরূহ ছিল। তাই একটানা ক্ষুধার্ত থেকেও কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল। তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা হয়ে গেলো।

হযরত নবী করীম (সাঃ)ও একজন সৈনিক হিসেবে খননকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবিগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং কোদাল দিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হলো। এ স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত করতেই আরেকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ এতে আমাকে সান্‌আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজ-প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে

বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে।

এ সংবাদে মদীনার মুনাফেকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তারা বলতে লাগলো ঃ দেখ, প্রাণ বাঁচানোই যাদের পক্ষে দায়; যারা শত্রুর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবা-স্বপ্ন দেখছে! আল্লাহ্ তাআলা এসব নির্বোধ জালেমদের উত্তরেই আলোচ্য قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ আয়াতটি নাযিল করেন।

এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পট পরিবর্তনে আল্লাহ্ তাআলার অপ্রতিহত শক্তি সামর্থের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

ভাল ও মন্দের নিরিখ ঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে بِيَدِكَ الْخَيْرُ অর্থ্যাৎ, তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানেও بيدك الخير والشر (তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ) কিন্তু আয়াতে শুধু خير (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্যে আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে।

মোটকথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়— আংশিক মন্দ মাত্র। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব-পালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তুই মন্দ নয়।

২৭ নং আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে—

تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ অর্থাৎ, আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবিষ্ট করে দিনকে বর্ধিত করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবিষ্ট করে রাত্রিকে বর্ধিত করে দেন।

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, নভোমণ্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য এবং সর্বক্ষুদ্র উপগ্রহ চন্দ্র-সবই আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান-জগত ও অন্যান্য শক্তি যে, আল্লাহ্ তাআলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন, পাখি থেকে ডিম, জীব থেক বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।

জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে জ্ঞানী-মূর্খ পূর্ণ-অপূর্ণ এবং মুমিন ও কাফের সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মা-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করলেই কাফেরের ঔরসে মুমিন অথবা মূর্খের ঔরসে জ্ঞানী পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলেই মুমিনের ঔরসে কাফের এবং জ্ঞানীর ঔরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন এবং নূহ (আঃ)-এর গৃহে তাঁর ঔরসজাত পুত্র কাফের থেকে যায়, আলেমের সন্তান জাহেল থেকে যায় এবং জাহেলের-সন্তান আলেম হয়ে যায়।

আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহ্ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই তা বোঝা যায়। প্রথমেই উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার শক্তিসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির সর্বোচ্চ শক্তি।

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, আপনি যাকেই ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন। কোন সৃষ্টজীব জানতে পারে না— যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত ঃ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতেহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের شَهِدَ اللّٰهُ আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং قُلِ اللّٰهُمَّ আয়াত بِغَيْرِ حِسَابٍ পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

"হে মুমিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে।"

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত ঃ এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোন কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অ-মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবিগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমনসব ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধীতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অ-মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্খা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অ-মুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছেঃ "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।— (বয়ানুল-কোরআন)

চতুর্থতঃ লেন-দেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরী, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ), খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকাহ্‌বিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকুরী প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরী করা সবই জায়েয।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাফেরের সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দমূলক ব্যবহার সবার সাথেই জায়েয রয়েছে ; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'রাহ্‌মাতুল্লিল-আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করেন তিনি অ-মুলমানদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ ভর্ৎসনাও করা হবে না। অ-মুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কখনও উত্থিত হয়নি। মুখে বদদোয়াও তিনি করেন নি। অ-মুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নব বীতে তাদের অবস্থান করতে দেন-যা ছিল মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অ-মুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও লেন-দেনমূলক ব্যবহার—নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্যে কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোন অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জিন-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ ও লতা-পাতার মত নয় যে, জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশের

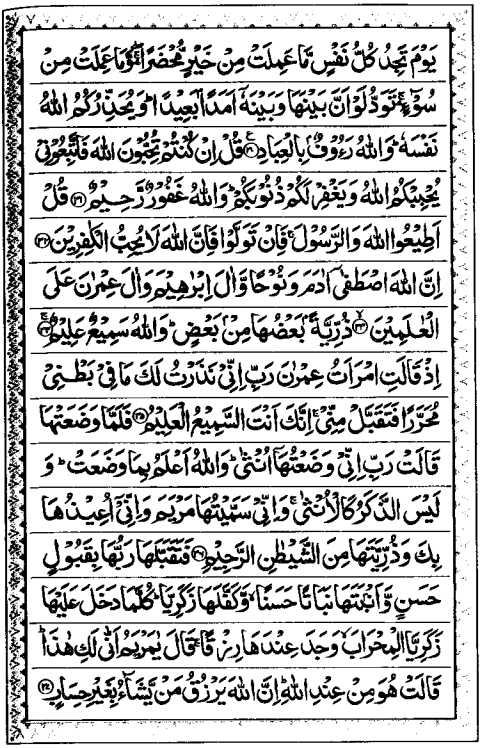

(৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম (আঃ), নূহ্ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। (৩৪) যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (৩৫) এমরানের স্ত্রী যখন বললো— হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো— বলল, হে আমার পালনকর্তা। আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই! আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি—অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। (৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন—'মারইয়াম'! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও এবাদতই যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ من احب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।" এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহ্র অনুগত। এ কারণে কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, ওরা কাফেরদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ স্বীয় মহান সত্তার প্রতি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদের আন্তরিক বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনেঅচল।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা ঃ হযরত নবী করীম (সাঃ-এর রেসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কিছু নযীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ
اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ
اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ
كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ
يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى
نِسَاۗءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ
مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (৪০) তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা!' বললেন, আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল—সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল,—হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব-নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকূকারীদের সাথে সেজদা ও রুকূ কর। (৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ—মারইয়াম-তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)–এর আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে তাঁর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোটকথা এই যে, শেষ জমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আঃ)–এর সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কারণে তাঁর পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গম্বরের তুলনায় অধিক যত্নবান।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে প্রচলিত এবাদত–পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। এসব উৎসর্গীকৃত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মরিয়মের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মান্নত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল–মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন পার্থিব কাজে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আন্তরিকতার বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা–দীক্ষা ও লালন–পালনের ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। এরূপ না হলে মরিয়মের জননী মান্নত করতেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا হযরত যাকারিয়া (আঃ) তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন।

সময়ও ছিল বার্ধক্যের— যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি–সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতঃপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এযাবৎ সাহস করে দোয়া করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ফলের মওসুম ছাড়াই মরিয়মকে ফল দান করেছেন, তখনই তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন ; যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেন–

قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্যে দোয়া করা পয়গম্বর ও সজ্জনদের সুন্নত।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

অর্থাৎ, হযরত নবী করীম (সাঃ)–কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে,তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং পয়গম্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়।

হযরত নবী করীম (সাঃ) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ

"বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।"

كلمة الله (আল্লাহ্‌র বাণী) – হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'কলেমাতুল্লাহ্' বলার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

وَحَصُورًا এটা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর মত হয়- অর্থাৎ, অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, من استطاع منكم الباءة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম– অন্যথায় নয়।– (বয়ানুল-কোরআন)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়ার তাৎপর্য ঃ

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ

– হযরত যাকারিয়া (আঃ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার মানে কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ্ তাআলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই।

قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশে হযরত যাকারিয়া (আঃ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না।

এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা এমন নিদর্শন দিলেন যে,তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হলো।

إِلَّا رَمْزًا এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এক বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে হযরত (সাঃ) বললেনঃ এ বাঁদী মুসলমান।– (কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, হানাফী মযহাব মতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা—কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিতো অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিতো, তবুও তা জায়েয হতো।– (বয়ানুল-কোরআন) অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশে লটারী জায়েয।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদীরা মরিয়মের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন সদ্যজাত শিশু ঈসা (আঃ) বলে ওঠেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার—যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাফের, পণ্ডিত, মূর্খ সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনে দেয়া হয়েছে যে, 'শৈশবাবস্থায় কথা বলা' বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে 'প্রৌঢ় বয়সের কথা' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থার কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধা সম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ
رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى
بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْــَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৪৭) তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি!' বললেন, এ ভাবেই'। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীল। (৪৯) আর বনী-ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় – আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই – যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা-তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। (৫২) অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন বনী-ইসরায়ীলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, আকাশে তুলে নেয়ার সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ, তিনি যৌবনের প্রারম্ভিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় বয়স— যাকে আরবীতে 'কূহ্ল' বলা হয়—তিনি এ জগতে সে বয়স পাননি। কাজেই প্রৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ কারণেই তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার, তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার।

পাখীর আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ – حواری শব্দটি حور ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিধানে এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী–তাঁদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তাঁরা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ভক্ত ও সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী।

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ, খাঁটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের।— (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন এবং مَنْ اَنْصَارِيْٓ বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুওয়তের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী দল গঠন করার চিন্তা করেননি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ
يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ
الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقَهٗ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَ
نِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ
عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ
اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

(৫৪) এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (৫৫) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো— কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। (৫৬) অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে— তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা। (৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন—হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (৬১) অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল ঃ 'এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।' (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্যভাষণ। আর এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আর আল্লাহ্; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যাঃ কোন কোন ফেরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত এবং আখেরী যমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদিসম্মত আকীদাকে ভুল প্রমাণ করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ আরবী ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ আয়াতে مكر শব্দের সাথে سيئ (মন্দ) যোগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে মকর শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্কে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহ্দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।— (তফসীরে-ওসমানী)

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ - متوفى শব্দের ধাতু توفى এবং মূলধাতু وفى অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া। وفاء ـ ايفاء ও استيفاء এসব শব্দেরও প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থই এর প্রমাণ। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে রূপক অর্থে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কোরআনে এ অর্থেও توفى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ
مَنَامِهَا

আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

দুররে-মনসুর গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ অর্থাৎ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব।

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, توفى শব্দের অর্থ মৃত্যু ; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ প্রথমে ও مُتَوَفِّيْكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيْكَ -কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয় ; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার

অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জেযা। এতদসঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং খ্রীষ্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আঃ) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেতো যে, তিনিও আল্লাহ্ তাআলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি কথা এই যে, কাফের ও মুশরেকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জেযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্ তাআলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, 'আদ সামুদ এবং সালেহ্ ও লূত পয়গম্বরের কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আঃ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই ছিল— তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই। অর্থাৎ, আদম (আঃ) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঈসা (আঃ)-এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থায় হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খ্রীষ্টানরা ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে ওদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই مُتَوَفِّيكَ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের খন্ডন। কারণ, ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা ওদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসও খন্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে বলেন ঃ কোরআন মজীদে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।— (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এতে বাহ্যতঃ ঈসা (আঃ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথা ঠিক যে, আরবী শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন— يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ এবং وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার রূপক। উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে رفع শব্দের সাথে الى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। "নিজের কাছে তুলে নেয়া" সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

ঈসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার ঃ আলোচ্য ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কেয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সাঃ) আগমন করে ইহুদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদারহণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদীরা ঈসার (আঃ) জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যাতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর

ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যাতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদীরা ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আঃ)-এর বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আঃ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খ্রীষ্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসার (আঃ) নবুওয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র ঃ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনী ছাড়া কিছুই নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। একারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদী রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও ধরেও নেয়া হয়, তবুও খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্যে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেয়ওয়ায়েতসমূহেই দেয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন ঃ জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আঃ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ঈসার (আঃ) শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদী তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসার (আঃ) ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসাকে (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেয ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের একাদশতম রুকূতে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূর বাইশটি আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আঃ)-এর জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আঃ)-এর বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরও গুণাবলী,আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য কি?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাঁদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। হযরত নবী করীম (সাঃ) তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফিৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্যে নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় নবুওয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজন বশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) তখনও নবুওয়ত ও রিসালতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী—যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয়,ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিপদাপদ মুমিনদের জন্যে প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ, তখন তো ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের উপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্ মাফ হয়। এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্র প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফেররা কুফরের কারণে আল্লাহ্র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।—(বয়ানুল কোরআন)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা ঃ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ ঈসা (আঃ)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আঃ)-কেও তদ্রূপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টিকে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।—(মাযহারী)

মুবাহালার সংজ্ঞা ঃ ..... فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই ঃ যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

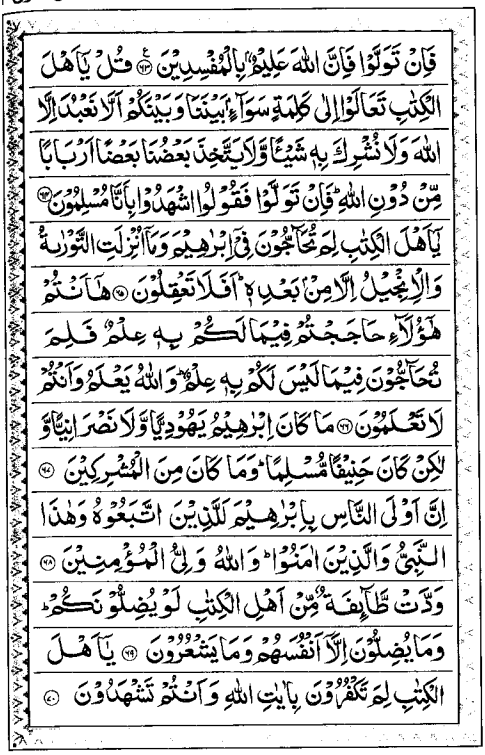

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَا أَنْتُمْ
هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَ
لَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا
النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

(৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে প্রমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। (৬৪) বলুন ঃ 'হে আহ্লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও, ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' (৬৫) হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৬) শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে,তাই নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? (৬৭) ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না,কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (৬৯) কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্খা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্র কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা?

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমি এই যে, মহানবী (সাঃ) নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা জিযিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্বীল, আবদুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্বিল ও জিবার ইবনে ফয়েজকে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসূলে খোদা (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে ঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ্র নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বললো ঃ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বলল ঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন।— (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

তবলীগের মূলনীতি ঃ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এ আয়াত থেকে তবলীগ তথা দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এক-ত্ববাদ। আমন্ত্রণলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

"আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি—যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। মুসলমান হয়ে যান ; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহ্লে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।"

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ এ আয়াতে 'সাক্ষী থাক' বলে আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তিপ্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি টানা উচিত—অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ
اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى
هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا
يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا
يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

(৭১) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। (৭২) আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ্ করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল। (৭৫) কোন কোন আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না— যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে। (৭৬) যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আল্লাহ্ পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ও اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্বাস করা বৈধ হবে। কারণ, কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ। এটা সর্বাবস্থায়ই অবৈধ। তবে স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর তিরস্কার ও ধিক্কারের যোগ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অমুসলমানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা ঃ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ এ আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের আমানতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে 'কিছু সংখ্যক লোক' বলে যদি ঐসব আহ্লে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহ্লে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অ-মুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি?

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখেরাতে শাস্তি হ্রাসের আকারে পাবে।

এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا – এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা করতে থাকার অধিকার তার রয়েছে। – (কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড)

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ঃ উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্যে জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত।

কোরআন ও সুন্নাহ্য় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত ৭৭ তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

(১) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্যে দোযখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন ঃ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি দোযখ অপরিহার্য হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা গাছের একটা তাজা ডালই হোক না কেন? – (মুসলিম)

(২) আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

(৩) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে রহ্মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

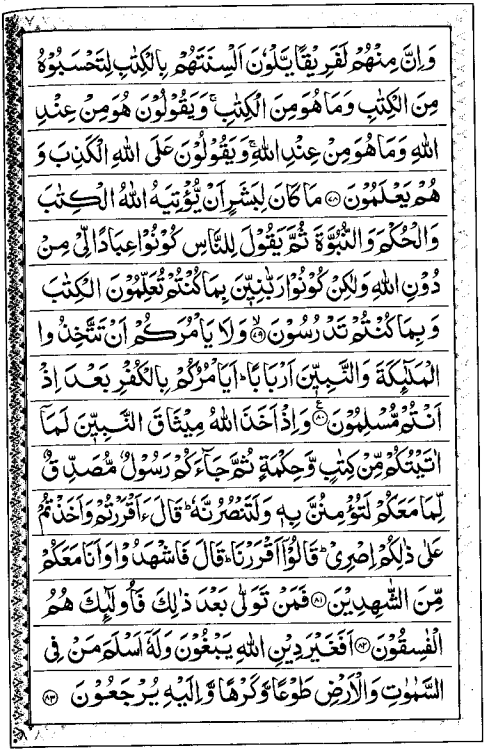

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ
مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ
اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ
مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহ্‌র কথা অথচ এসব আল্লাহ্‌র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌রই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ্ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও' -- এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে? (৮১) আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমারা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ?' তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (৮২) অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হলো নাফরমান। (৮৩) তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(৪) আল্লাহ্ তাআলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না।

(৫) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি ঃ مَا كَانَ لِبَشَرٍ নাজরানের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার তেমনি উপাসনা করি, যেমনি খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপাসনা করে? হযরত (সাঃ) বলেছিলেন ঃ (মা'আযাল্লাহ্) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের এবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি আহবান জানাই? আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশে প্রেরণ করেননি। এ কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে কিতাব, হেক্‌মত ও পয়গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সে কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দু'টি বিষয় চিন্তা করে নেয়:

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না?

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায়? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানে যে, সে খোদায়ী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লঙ্ঘন করবে না, তবে পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ্)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

আল্লাহ্ তাআলার তিনটি অঙ্গীকার ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আ'রাফের اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর এ ভিত্তির উপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে

আরও আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহ্‌লে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। لِلنَّاسِ

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ এ উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে। – (তফসীরে-আহমদী)

مِيْثَاقَ এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেয়া হয়েছে ঃ এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। – (বয়ানুল-কোরআন)।

কি অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী ও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল— যাতে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। – (তফসীরে ইবনে কাসীর)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ
وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে নেয়া হয়েছিল। – (তফসীরে – আহ্‌মদী)

উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে। – (ইবনে-কাসীর)

মহানবী (সাঃ)-এর বিশ্বজনীন নবুওয়ত ঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন পয়গম্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন— যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী বলেন ঃ এ আয়াতে রসূল বলে মুহাম্মদ (সাঃ)–কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি। যদি মহানবী (সাঃ) সেসব পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তারা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। এক হাদীসে এরশাদ করেছেন ঃ "আজ যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না।"

অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ যখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধানই পালন করবেন।— (তফসীরে ইবনে-কাসীর)

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সাঃ)–এর নবুওয়ত বিশ্বজনীন। তাঁর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে بعثت الى الناس كافة (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত শুধু তাঁর আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে—হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তাঁর নবুওয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদমের নবুওয়তেরও পূর্ব থেকে এর আরম্ভ। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম। হাশরের ময়দানে শাফাআতের জন্যে অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তাঁর বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ।

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ
أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ
مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

(৮৪) বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৮৬) কেমন করে আল্লাহ্ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছে। আর আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত (৮৮) সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হাল্‌কাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৯০) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না— আর তারা হলো গোমরাহ্। (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামই মুক্তির পথ ঃ ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়তের জন্যে প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' বলেছেন—একথাও কোরআন থেকেই প্রমাণিত। শেষ নবী (সাঃ)-এর উম্মতকে বিশেষভাবে 'মুসলিম' বলাও কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে। هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

মোটকথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন্ অর্থ বোঝানো হয়েছে।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্যে তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে ইসলাম দেয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হুযুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আজ যদি হযরত মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুওয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর অবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাবাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ
شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا
مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

(৯২) কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন। (৯৩) তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী-ইসরায়ীলদের জন্য হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।' (৯৪) অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই যালেম – সীমালংঘনকারী। (৯৫) বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (৯৬) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (৯৭) এতে রয়েছে 'মকামে-ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না— আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (৯৮) বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহ্র কিতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে (৯৯)। বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্র পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান কর— তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। (১০০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক নিজ হাতে কোন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগলো ঃ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেন ঃ এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো? অর্থাৎ এটা মর্যাদা দানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। – (বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম প্রেরণা ঃ সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কোরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কোরআনী নির্দেশ পালনের জন্যে তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তালহা (রাঃ)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বীরহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে-মজীদীর সামনে 'আস্তফা-মনযিল' নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে। এতে মদীনা যিয়ারতকারী হাজিগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোণে 'বীরহা' কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত আবু তালহা এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন।- (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না— পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরয করেন ঃ আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সাঃ)-তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র ওসমানকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে-হারিসা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার দান গৃহীত হয়েছে।- (তফসীরে-মাযহারী, ইবনে জারীর, তিবরানী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে— কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খ্রীষ্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। একথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বললোঃ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উত্তরে বললেন ঃ ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল ঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) 'ইরকুন্নিসা' (সাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রূহুল-মা'আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (তফসীরে-কবীর)

আলোচ্য ৯৬ নং আয়াতে সারা বিশ্বের সকল গৃহ এমন কি, মসজিদ ও উপাসনালয়সমূহের মোকাবিলায়ও কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক ঃ

কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাসঃ প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম উপাসনালয়।

দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্কায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাক্কা) অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্ব প্রথম উপাসনালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ এবাদতের জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ, ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, সুদ্দী প্রমুখ সাবাঈ ও তাবেয়িগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু এবাদতের জন্যে কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদেরকে তা তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ— যা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। – (ইবনে কাসীর)

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে মহানবী (সাঃ)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। – দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি-একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কোরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে— যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সে'ই যেন প্রবেশ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটিও মুছে ফেলতে মনস্থ করে ! সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের এ কাজ ঠিক হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'বা

গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কোরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্যে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম উপাসনালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁরা কা'বা গৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেননি, বরং সাবেক ভিত্তির উপরই নির্মাণ করেন। আয়াত وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্জের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ অর্থাৎ, যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুর স্তূপের নীচে লুক্কায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়া হয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্ব প্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম উপাসনালয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবু যর (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি? উত্তর হলো ঃ মসজিদে হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হলো মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো ঃ চল্লিশ বৎসর।

এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রামাণিত রয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীমের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়।

আদিকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে لِّلنَّاسِ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তাআলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লেখিত 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'।

কা'বা গৃহের বরকত ঃ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কা'বা গৃহকে 'মোবারক' (বরকতময়) বলা হয়েছে। 'মোবারক' শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। বরকত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দু'ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। (এক) প্রকাশ্যতঃ বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। (দুই) তদ্দ্বারা এত বেশী কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশী বস্তু দ্বারা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে 'বৃদ্ধি পাওয়া' বলা যেতে পারে।

কা'বা গৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে, সব রকম ফল-মূল, তরি-তরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণে মজুদ থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীর জন্যেই নয়— বহিরাগতদের জন্যেও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষতঃ হজ্জের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হয়ে থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু'চার দিন নয়— কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্জের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভীড় না থাকে। বিশেষতঃ হজ্জের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌঁছে কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুম্বাও কোরবানী করেন। গড়ে জনপ্রতি একটি কোরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বড় একটা বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না।

এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা— যা উদ্দিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্নয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় প্রধান এবাদত, বিশেষ করে কা'বা গৃহেই করা যায়। এসব এবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বা গৃহের কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ হজ্জ ও ওমরা। আরও কিছু এবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, বাস গৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ' নামাযের, মসজিদে আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।— (ইবনে মাজাহ্, তাহাভী)

হজ্জের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্জব্রত পালনকারী মুসলমান বিগত গোনাহ্ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে

যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে। এগুলো কা'বা গৃহেরই অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে هدى বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে।

কাবা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ আলোচ্য ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্জব্রত পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তাআলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হরমে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কঙ্কর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তূপের নীচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। অথচ হজ্জের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দেখা যায় না। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুযূর (সাঃ)-বলেন ঃ ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কঙ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই ; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) খাসায়েসে কুবরা নামক গ্রন্থে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতক মু'জেযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরী কর দেখি। এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কঙ্করই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জেযা এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মকামে-ইবরাহীম ঃ মকামে-ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মকামে-ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেতো এবং নীচে অবতরণের সময় নীচু হয়ে যেতো। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উঁচু ও নীচু হওয়া এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা- এসবই আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কোরআনে মকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মকামে-ইবরাহীমকে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই মকামে-ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ-পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায়। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা ঃ কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসেবে— অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হরম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হরমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যতবড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না ; হরম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেট করে চলে যেতো ; কিছুই বলতো না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হরমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুযূর (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ
وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ
مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۗ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ
فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা আল্লাহ্‌র কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। (১০২) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে—তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (১০৬) সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহ্‌মতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ্ বিশ্ব-জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না।

গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে হরমে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেনঃ আমার পূর্বে কারো জন্যে হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান এবং হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বা গৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে হাজ্জাজের একাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্যে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বা গৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণীর মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনখারাবীকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য।

কা'বা গৃহের হজ্জ্ব ফরয হওয়াঃ ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বা গৃহের হজ্জ্ব ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী-ঘরে চলাফেরাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্জ্বের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ হজ্জে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়ায়ও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজ্জ্বের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে।

হজ্জ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ্ব বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হজ্জ্বের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তিঃ আলোচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতের প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা। অর্থাৎ, তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 'ভয় করা' ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' (আল্লাহ্‌ভীরু) বলা যায়—যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যেও কোরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য— তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের পছন্দনীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর! আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اتَّقُوا اللهَ বলার পর حَقَّ تُقٰتِهٖ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ্ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা— কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা— অকৃতজ্ঞ না হওয়া।— (বাহ্‌রে মুহীত)

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— 'সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস বলেন : এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থী হবে না।

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ এতে বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐকবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ জগতের কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না ; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি ; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্যে একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে— যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের মস্তিস্কনিঃসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে— বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোনটি? ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রীষ্টানরা ইঞ্জীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবী করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবী করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا (আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহ্‌র রজ্জু' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে হুযুর (সাঃ) বলেন :

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ্ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত।— (ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে حبل الله هو القران অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।'— (ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন পদ্ধতিতে 'হাবল' এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা দ্বীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোটকথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা, প্রথমতঃ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা কোরআনকে কাজে-কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অবশ্য

কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণতঃ একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যাবে।

এছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব ঃ ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শকে এক জাতি ও বনু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা একজাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম—প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্নজাতি। উদাহরণতঃ ভারতের হিন্দু ও আর্যসমাজের কথা বলা যায়।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকন্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি— যারা আল্লাহ্‌র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফেররা ভিন্ন জাতি- যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর,যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছেঃ وَلَا تَفَرَّقُوا পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়।

এছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই ঃ (এক)— তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। (দুই)— আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে। (তিন)— শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই ঃ (এক)— অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান। (দুই)— বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং (তিন)— সম্পদ বিনষ্ট করা।— (ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ফেকাহ্‌বিদ আলেমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দ্বীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয়।

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুনাখুনী ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ঃ কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা। সম্প্রীতি বা ঘৃণা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তাআলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গোনাহ্ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূর পরাহত।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ অর্থাৎ, এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন- যাতে তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাক।

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ

প্রথমে খোদাভীতি ও আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে ১০৪ নং দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে।

দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ্ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা 'ওয়াল আসরে' বর্ণনা করা হয়েছেঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ দেয়।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। পূর্ববর্তী আয়াতে 'আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর' বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অপরারপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে যাতে আল্লাহ্র রজ্জু তার হাত থেকে ফস্কে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল - ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন ঃ আল্লাহ্র এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে।

'সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ' করণের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে। উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে,তা ওয়াজিব নয় ; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে।

'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝার সম্ভাবনা ছিল যে,এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ, যখন চোখের সামনে অসৎকাজ হতে দেখা যায়। কিন্তু يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করা; তখন অসৎকাজ হতে দেখা যাক, বা না যাক অথবা কোন ফরয আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করতে থাকা।

কল্যাণের প্রতি আহবানেরও দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় অমুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি আহবান করা। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহবান করবে মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও। সেমতে জেহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ, তারা সাচ্চা মুসলমান ,যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে— যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তথা যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহবান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে,তবে বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দুর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন ঃ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে-কেরামের দল।— (ইবনে-জারীর) কেননা, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহবান করা। অর্থাৎ, সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লেখিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহবানও দু'প্রকার। একটি ব্যাপক আহবান, অর্থাৎ, সব মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ আহবান। অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছে ঃ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ, তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে।

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব সৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার'-এর

অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজেবাত' (জরুরী করণীয় কাজ) ও 'মাআসী' (গোনাহ্‌র কাজ)–এর পরিবর্তে 'মারুফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা–মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতেহাদী মাসআলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আজকাল ইজতেহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গোনাহ্‌র কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় না। আয়াতের শেষাংশে এ আহবানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য।

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে–কেরামের দল। তাঁরা কল্যাণের প্রতি আহবান এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করেন। বিশ্বকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা দেন এবং পুণ্য ও খোদাভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

অর্থাৎ— তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর মতবিরোধ করেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্ তাআলার পরিস্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা–বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ–কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا আয়াতের পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াতে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধতা সমগ্র জাতিকে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি আহবান এবং 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' দ্বারা এ ঐক্যবদ্ধতাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপর وَلَا تَفَرَّقُوا এবং وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।

আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা–প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে 'উজ্জ্বল নির্দেশাবলী আসার পর' বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দ্বীনের মূলনীতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে. । কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নাই। কিন্তু যেসব শাখা–প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে যদি ইজতেহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লেখিত নিন্দার আওতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ যদি কেউ ইজতেহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতেহাদে ভুল করে তবুও একটি সওয়াব পাবে।

এতে বুঝা যায় যে, ইজতেহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে–কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতেহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন ঃ সাহাবায়ে–কেরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্যে রহমত ও মুক্তির কারণ স্বরূপ।— (রুহুল–মা'আনী)

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েয নয় ঃ এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফেকাহ্‌বিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'–এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়,তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি–গালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না।এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব–কলহ,বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতেহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়,তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে! আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ককেই দ্বীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি–গালাজ, লড়াই–ঝগড়া,

এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায়নি।

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ ঃ মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মু'মিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত,আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কাল মুখ কারা ঃ এরা কারা— এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনী-কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমণ্ডল কালো হবে।— (কুরতুবী)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামাহ্ বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন ঃ হাদীসটি যদি অন্ততঃ সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না।— (তিরমিযী)

হযরত ইকরিমাহ্ বলেন ঃ আহ্‌লে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ, যারা হুযূর (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত -প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। — (কুরতুবী)

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। (এক)— আল্লাহ্ তাআলা يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ বাক্যের প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমণ্ডল উল্লেখ করেছেন। কারণ, এরা আল্লাহ্‌র শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বলে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শাস্তিদানের উদ্দেশে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(দুই)— শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত এবাদতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, এবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ এবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।— (তফসীরে-কবীর)

(তিন) — আল্লাহ তাআলা فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যাংশের পর পর هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ তাআলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে না বরং সর্বকালীন হবে। এ নেয়ামত কখনও বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্যে একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গোনাহর শাস্তিই লাভ করে ঃ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন ঃ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ,— আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবী হিসেবেই দেয়া হয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۭ وَلَوْ
اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ١١٠ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۭ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ
الْاَدْبَارَ ۣ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ١١١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا
ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۭ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ١١٢ لَيْسُوْا سَوَاۗءً ۭ مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۗىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۗءَ الَّيْلِ وَ
هُمْ يَسْجُدُوْنَ ١١٣ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ١١٤ وَمَا يَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ١١٥

(১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র প্রতিই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহ্‌র গযব। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে। (১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ্‌ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ ঃ মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। —(মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থ সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্বলাভ করেছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জেহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে—যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'—এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বর ও উম্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহ্‌লে -কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কেউ কেউ মুমিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে-কেরামের সাথে নবুওয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا
بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

(১১৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী– তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল। (১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না– তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৯) দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে– 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ্ মনের কথা ভালই জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই – তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে। (১২১) আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন।

ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থ : সূরা বাক্বারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ - এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। — (মা'আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশ্‌শাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। (এক) – আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার । উদাহরণত ঃ নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। (দুই) وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, —অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যাকিছু শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ – অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بِطَانَةً শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بِطَانَةً বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بطن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظهر। কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظهر এবং আভ্যন্তরীণ দিককে بطن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظهارة এবং ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে بِطَانَةً বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি ঃ সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ, সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে بِطَانَةً বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ লিসানুল-আরবে بِطَانَةً শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে ঃ 'কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بِطَانَةً বলা হয়।'

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু

মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)– এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রের অ–মুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।" অন্য এক হাদীসে বলেনঃ "চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন।" আর এক হাদীসে বলেনঃ "সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অ–মুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।"

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)–কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।"

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।"

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় — এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না।

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয়েছেঃ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ, তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খ্রীষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক — কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তাআলা শত্রু–মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ অর্থাৎ — তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ— এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নাই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফেরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ অর্থাৎ — তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছেঃ "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।"

ধৈর্য ও পরহেযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য: যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে কোরআন ধৈর্য ও তাকওয়া–পরহেযগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ
أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ
أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ
مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ
هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَ
يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১২২) যখন তোমাদের দু' টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুতঃ আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক,. যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে —তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন! (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন— যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৩০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (১৩১) এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি ঃ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কোরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কোরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কোরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে ঃ আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়— যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কোরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো— যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযুর (সাঃ)-এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন ঃ একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গাম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, পয়গম্বর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যেও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী (সাঃ) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ

মত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুযুর-আকরাম (সাঃ) সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পন করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কোরাইশরা বদরযুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবীর (সাঃ) সামরিক প্রজ্ঞা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও পূত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও তাঁর তুলনা নাই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমর-কুশলীরাও মহানবী (সাঃ) প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ 'একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সাঃ) শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি যুদ্ধের মোকাবেলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।' এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাশুারসনের। লেখকের 'লাইফ অব মোহাম্মদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধের সূচনা ঃ অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযুর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল ঃ হুযুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রুসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাহাদত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযুর স্বয়ং আহত। পরাজয়- পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকী ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবীগণ জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে —যা মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

ওহুদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা ঃ

(১) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোরাইশরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্যে নারীদেরকে সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এ সময় নবী করীম (সাঃ) -এর পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি। আমার জন্যে আল্লাহ্ তাআলাই যথেষ্ট —তিনি উত্তম অভিভাবক।" এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

(২) দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নজীর ইতিহাসে দুর্লভ। হযরত আবু দাজানা নিজ দেহ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়েছিল। হযরত তালহাও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। হযরত আনাসের চাচা আনাস ইবনে নসর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কাফের বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন ঃ

সা'দ কোথায় যাচ্ছ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি, একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর কাছে মাত্র এগার জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কোরাইশ সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কে এদের প্রতিরোধ করবে? হযরত তালহা (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ আমি, ইয়া রসূলাল্লাহ। অন্য একজন আনসার সাহাবী বলেন ঃ আমি হাজির আছি, মহানবী (সাঃ) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রাঃ) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহার বাসনা পূর্ণ হলো না। এভাবে সাত বার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তাঁরা শহীদ হয়ে যেতেন।

বদরযুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তবুও পরাজয় বরণ করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয়, বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, বিজয় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তাঁর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গণ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) – এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন ঃ

قد جاءنى كتابكم تستمدوننى وانى ادلكم على من هو اعز نصرا واحصن جندا اللهُ عزوجل فاستنصروه . فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر فى يوم بدر فى اقل من عدتكم فاذا جاء كم كتابى هذا فقاتلوهم ولاترجعونى

—'তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি —যাঁর সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যাঁর সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন! তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সাঃ) বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র পৌছা মাত্রই তোমরা শত্রু সৈন্যে উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।"

এ ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করে অগণিত কাফের বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। হযরত ফারূকে আযম জানতেন, মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ, "হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসেনি।" এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ – অর্থাৎ, "আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয়ে যুদ্ধার্থ মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যূহে সংস্থাপিত করেছিলেন।"

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত ঃ কখন গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন, তা غَدَوْتَ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা।

এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছিল। مِنْ أَهْلِكَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার – পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার ছিল। এসব খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেলে তা পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিৎ। এর পর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গণের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

অর্থাৎ, আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করেছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী, এই দুইটি গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্ তাআলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার কোনটিই তাঁর অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর অজ্ঞাত নয়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে– إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا অর্থাৎ, তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হেশাম এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا বাক্যটি তাদের ঈমানের

পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের কোন কোন বুযুর্গ বলতেন ঃ আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে।

এ আয়াতের শেষভাবে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক ও সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রাম করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার।

'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সুফী বুযুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্যে গর্ব না করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গণে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরী করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সাঃ) স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ্ তাআলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কেচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই করে। পক্ষান্তরে অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে – যাতে মুসলমানরা পুরাপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তাআলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান ঃ মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর।

তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই তওহীদ ও শেরেকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরী, ১৭ই রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ শুক্রবার দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল-ফোরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন —এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ – অর্থাৎ, তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর —যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ধৈর্য ও খোদাভীতিকে প্রতিকার হিসেবে বর্ণনা করেছে। বলাবাহুল্য, এ দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এ উভয়টিকে উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য ঃ এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণত ঃ কওমে-লূতের বস্তি একা জিবরাঈলই (আঃ) উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কোরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ, ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। আয়াতের শব্দ اِلَّا بُشْرٰى এবং وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ —অস্থির হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়ম মাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেয়া।

আরেকটি পন্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনও দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও আওয়াজ দিয়ে এবং কখনও অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ —আয়াতের এক তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন

হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।—(হাকেম)

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি اقدم حيزوم বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেস্তাকে দেখেছেনও।—(মুসলিম)

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জেহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পন করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গোনাহ্ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে সূরা আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ, শত্রু সংখ্যা যত, ততসংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

—যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে —মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটি এই ঃ

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কোরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। —(রূহুল-মা'আনী) পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয় —যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশী হয়ে যায়।

অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়। শর্ত ছিল দু'টি ঃ (এক) মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্‌ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ – এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ঃ "যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফেরের জন্যে বদদোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কয়েকগুণ বেশী, অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে —যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

আলোচ্য ১৩২ নং আয়াতে দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (এক) প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের সাথে রসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, রসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি?

(দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য ঃ প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর,

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَن يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
جَنّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ
الْعٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَ
لَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ
الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾

(১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। (১৩৪) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। (১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান—কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রসূল (সাঃ) —এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল (সাঃ) –এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', আনাস ইবনে-মালেক 'নামাযের প্রথম তাকবীর', সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের 'এবাদত পালন', যাহ্হাক 'জেহাদ' এবং ইকরিমা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। (এক) এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ – যে কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুযুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়— বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ পুণ্যার্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার

করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ত্রুটির জন্যে অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্যে হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা'হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

—'সততা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো ঃ আপনাকেও নয়কি—ইয়া রসূলাল্লাহ্। উত্তর হলো ঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।'

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তাআলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহ্র ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশে একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশে مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ বলা হয়েছে। 'পালনকর্তা' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্যে জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়— এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীর-কবীরে বলা হয়েছে ঃ

- "আবু মুসলিম বলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, জান্নাত মোত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার যমীন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসী মোত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক স্থানে স্থানে সৎলোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে। কোথাও صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দ্বীনের সরল ও বিশুদ্ধ পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মোত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলী বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মোত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চস্তর বিধৃত করে সৎলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্যে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে 'হুকুল-ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্র হক) বলা যেতে পারে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহ্র অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নাই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সব কিছুর উর্ধ্বে। তাঁর এবাদত দ্বারা স্বয়ং এবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটেন। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে,তখনই তাঁর দয়ার দরবার থেকে এক নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকুকুল-ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ত্রুটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শান্তি

সখ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছেঃ

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ অর্থাৎ, মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তাআলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা আল্লাহ্র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হল এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহ্ভীরু এবং আল্লাহ্র প্রিয়বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না।

আল্লাহ্র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয়ঃ আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন يُنفِقُونَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্যঃ এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্কে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) —রসূলুল্লাহ (সাঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলতোঃ আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। (দুই) —খোদ নবী করীম (সাঃ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) —মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য ; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ বিষণ্ন হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রসূলের (সাঃ) আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন, আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে সাহাবায়ে-কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্যে তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও তার দাবীসমূহ পুরণ করা। যুদ্ধের জন্যে যেসব প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।